বাংলাভাষার নেতৃত্ব গ্রহণ করুন

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

আবুল হাসান আলী নদভী

১৪ই মার্চ, ১৯৮৪ কিশোরগঞ্জের জামিয়া এমদাদিয়া প্রাঙ্গনে বিশিষ্ট আলিম, ইসলামী বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ। প্রথমে তিনি ওলামায়ে হিন্দের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড ও যুগান্তকারী অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারপর বাংলাদেশের আলিম ও তালিবানে ইলমের প্রতি ওলামায়ে হিন্দের কর্মধারা অনুসরণের আহবান জানান। তাঁর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ এই যে, বাংলাদেশে ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর এই সংকটসন্ধিক্ষণে ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। প্রথমত ইসলামের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক অটুট রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত আলিম সমাজকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় এদেশে আলিম সমাজের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যেতে পারে।

****

উপস্থিত ওলামায়ে কিরাম এবং আমার প্রিয় তালিবানে ইলম! এতক্ষণ আমি হিন্দুস্তানী ওলামায়ে কেরামের সংস্কারআন্দোলন এবং কীর্তি ও অবদানের কথা আলোচনা করলাম এবং সফলতার যে চিত্র তুলে ধরলাম, যদি বাংলাদেশে আপনারা সেই সফলতা অর্জন করতে চান তাহলে আপনাদেরও একই পথ ও পন্থা অনুসরণ করতে হবে।

আপনাদের প্রথম কর্তব্য হবে দেশ ও জাতির চিন্তার গতিধারা এবং স্বভাব ও প্রবণতা সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকা এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখা। আপনাদের মুহূর্তের অসতর্কতার সুযোগে ইসলামের শত্রুরা এ জাতিকে নিয়ে যেতে পারে জাহেলিয়াতের পথে অনেক দূরে। কারণ আপনারাই হলেন এ জাতির ঈমান-আকীদা ও চিন্ত-চেতনার অতন্দ্র প্রহরী। প্রহরী অসতর্ক বা তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে কোন দুর্গ শত্রুর হামলা থেকে নিরাপদ হতে পারে না। সুতরাং আপনাদেরকে পূর্ণ সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে, যেন ইসলামের সঙ্গে এদেশের সম্পর্ক বিন্দুমাত্র শিথিল না হয়। যে দেশ এবং যে জাতির খিদমতের জন্য আল্লাহ আপনাদের নির্বাচন করেছেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে একদিন আপনাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। নবীর ওয়ারিছ ও উত্তরাধিকারী হিসেবে অবশ্যই আপনাদেরকে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে যে, সেখানে তোমাদের উপস্থিতিতে আমার উম্মত কীভাবে ইসলামের দুশমনদের প্রতারণার শিকার হলো? কীভাবে দ্বীন থেকে সরে গেলো? এ দেশের শাসক যারা, রাজনৈতিক কর্ণধার যারা, তারা জিজ্ঞাসিত হবে কি না, সে প্রশ্ন এখানে নয়। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সবার আগে ওলামায়ে কেরামের কাছেই কৈফিয়ত চাওয়া হবে যে, তোমরা বেঁচে থাকতে আমার রেখে আসা দ্বীনের এমন করুণ অবস্থা হতে পারলো কীভাবে? কোন মুখে আজ আমার সামনে দাঁড়িয়েছো? আল্লাহ হেফাযত করুন, হাশরের ময়দানে আল্লাহর নবীর সামনে যেন লজ্জিত না হতে হয়? আপনারা জানেন, ইরতিদাদের ফিতনার যুগে আল্লাহর রাসূলের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) পরিবেশ ও পরিস্থিতির সকল প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে গর্জে উঠেছিলেন- আমি বেঁচে থাকবো, আর দ্বীনের অঙ্গহানি হবে?

আপনাদের দেশে এখন ইরতিদাদের ফিতনা শুরু হয়েছে, চিন্তার ইরতিদাদ। সুতরাং সেই ছিদ্দীকীঈমান বুকে নিয়ে আপনাদেরও আজ গর্জে ওঠতে হবে বাতিলের বিরুদ্ধে, “আমরা বেঁচে থাকতে দ্বীনের ক্ষতি হবে?” না, তা হতে পারে না। এখন আপনারদেরকে গৌণ মতপার্থক্যগুলো ভুলে গিয়ে দ্বীন ও ঈমান রক্ষার বৃহত্তর ও মৌলিক লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটে নিপতিত জাতির এ মুহূর্তে বড় প্রয়োজন ওলামায়ে উম্মতের ঐক্যবদ্ধ পথনির্দেশনার।

ইখলাছ ও আত্মত্যাগ, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা এবং উন্নত চরিত্রের আলো দ্বারা জাতির সেই অংশটিকে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করুন, তাকদীরের ফায়সালায় যাদের হাতে আজ দেশ শাসনের ভার অর্পিত হয়েছে, কিংবা আগামীকাল অর্পিত হতে চলেছে। এ যুগে শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য অপরিহার্য যোগ্যতা, দক্ষতা ও উপায়-উপকরণ যাদের হাতে রয়েছে, জাতির সেই সংবেদনশীল অংশটিকে দ্বীনের কাজে প্রতিদ্বন্দ্বী না বানিয়ে সহযোগী বানাবার চেষ্টা করুন। শুধু এবং শুধু দ্বীনের ফায়দার উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা আপনাদের অপরিহার্য কর্তব্য। অত্যন্ত হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে তাদেরকে তাদের ভাষায় এবং তাদের মেযাজে বোঝাতে হবে।

আপনাদের সম্পর্কে তাদের মনে এ বিশ্বাস ও আশ্বাস যেন অটুট থাকে যে, আপনারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নন, বরং তাদের ও উম্মতের প্রকৃত কল্যাণকামী। আপনারা নি:স্বার্থ ও আন্তরিক। তাদের কাছে আপনাদের যেন কোন প্রত্যাশা না থাকে। চাওয়া-পাওয়ার কোন প্রশ্ন যেন না থাকে। সুয়োগ সুবিধার কথা হয়ত বলা হবে, লোভ ও প্রলোভনের হাতছানি হয়ত আসবে; এমনকি হয়ত বা সুযোগ গ্রহণের মাঝে দ্বীনের ফায়দা নজরে আসবে। এ বড় কঠিন পরীক্ষা। তখন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর অটল-অবিচল থাকতে হবে। ওয়ারিছে নবীর ঈমান ও বিশ্বাস এবং ইতমিনান ও প্রশান্তি নিয়ে আপনাদের তখন বলতে হবে, তোমাদের দুনিয়া তোমাদের জন্য মোবারক হোক, আমরা তো দ্বীনের রাস্তায় তোমাদের কল্যাণ চাই। তোমাদের আখেরাতের সৌভাগ্য চাই। মনে রাখবেন, আপনাদের বিনিময় আল্লাহর কাছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ আপনাদের বিনিময় দিতে পারে না।

> দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো এ দেশের ভাষা ও সাহিত্য। বাংলাভাষাকে অন্তরের মমতা দিয়ে গ্রহণ করুন এবং মেধা ও প্রতিভা দিয়ে বাংলাসাহিত্যচর্চা করুন। কে বলেছে, এটা অস্পৃশ্য ভাষা? কে বলেছে, এটা হিন্দুদের ভাষা? বাংলাভাষা ও সাহিত্য চর্চায় পুণ্য নেই, পুণ্য শুধু আরবীতে, উর্দুতে, কোথায় পেয়েছেন এ ফতোয়া? এ ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী ধারণা বর্জন করুন। এটা অজ্ঞতা, এটা মূর্খতা এবং আগামীদিনের জন্য এর পরিণতি বড় ভয়াবহ। এ যুগে ভাষা ও সাহিত্য হলো চিন্তার বাহন, হয় কল্যাণের চিন্তা, নয় ধ্বংসের চিন্তা। বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে আপনারা শুভ ও কল্যাণের এবং ঈমান ও বিশ্বাসের বাহনরূপে ব্যবহার করুন। অন্যথায় শত্রুরা একে ধ্বংস ও বরবাদির এবং শিরক ও কুফুরির বাহনরূপে ব্যবহার করবে।

সাহিত্যের অঙ্গনে আপনাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করতে হবে। আপনাদের হতে হবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক-সাহিত্যিক ও বাগ্মী বক্তা। ভাষা ও সাহিত্যের সকল শাখায় আপনাদের থাকতে হবে দৃপ্ত পদচারণা। আপনাদের লেখা হবে শিল্পসম্মত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। আপনাদের লেখনী হবে জাদুময়ী ও অগ্নিগর্ভা, যেন আজকের ধর্মবিমুখ শিক্ষিত সমাজ অমুসলিম ও নামধারী মুসলিম লেখক-সাহিত্যিকদের ছেড়ে আপনাদের সাহিত্য নিয়েই মেতে ওঠে এবং আপনাদের কলম-জাদুতেই আচ্ছন্ন থাকে।

দেখুন; এ কথা আপনারা লখনৌর অধিবাসী, উর্দুভাষার প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং আরবী ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তির মুখ থেকে শুনছেন। আলহামদু লিল্লাহ, আমার বিগত জীবন কেটেছে আরবী ভাষার সেবায় এবং আল্লাহ চাহে তো আগামী জীবনও আরবী ভাষারই সেবায় হবে নিবেদিত। আরবী ভাষা আমাদের নিজেদের ভাষা, বরং আমি মনে করি যে, আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের কথা থাকুক, আল্লাহ শোকর আমার খান্দানের অনেক সদস্যের এবং আমার ছাত্রদের অনেকের সাহিত্যপ্রতিভা খোদ আরবসাহিত্যিকদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আরবরাও নিঃসংকোচে তা স্বীকার করে।

বন্ধুগণ! উর্দুভাষার পরিবেশে যে চোখ মেলেছে, আরবী সাহিত্যের সেবায় যার জীবন-যৌবন নিঃশেষ হয়েছে সে আজ তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতার সাথে বলছে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে ইসলাম বিরোধী শক্তির রহম করমের উপর ছেড়ে দিও না। ওরা লিখবে, তোমরা পড়বে- এ অবস্থা কিছুতেই বরদাশত করা উচিত নয়। মনে রেখো, লেখা ও লেখনীর রয়েছে অদ্ভূত প্রভাবক শক্তি, এর মাধ্যমে লেখকের ভাব-অনুভূতি, এমনকি তার হৃদয়ের স্পন্দনও পাঠকের মাঝে সংক্রমিত হয়। অনেক সময় পাঠক নিজেও তা অনুভব করতে পারে না। অবচেতন মনে চলে তার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান লেখকের লেখনী পাঠকের অন্তরেও সৃষ্টি করে ঈমানের বিদ্যুৎ প্রবাহ। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ) বলতেন-

পত্রযোগেও মুরীদের প্রতি তাওয়াজ্জুহ আত্মসংযোগ নিবদ্ধ করা যায়। শায়খ তাওয়াজ্জুহসহকারে মুরীদের উদ্দেশ্যে যখন পত্র লেখেন তখন সে পত্রের হরফে হরফে থাকে এক অত্যাশ্চর্য প্রভাবশক্তি।

এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও রয়েছে। আমাদের মহান পূর্ববর্তীদের রচনাসম্ভার আজো বিদ্যমান রয়েছে। পড়ে দেখুন,

আপনার ছালাতের প্রকৃতি বদলে যাবে। হয়ত পঠিত বিষয়ের সঙ্গে ছালাতের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু লেখার সময় হয়ত সে দিকে তাঁর তাওয়াজ্জুহ নিবদ্ধ ছিলো। এখন সে লেখা পড়ে গিয়ে ছালাত আদায় করুন; হৃদয় জীবন্ত এবং অনুভূতি জাগ্রত হলে অবশ্যই আপনি উপলব্ধি করবেন যে, আপনার ছালাতের রূপ ও প্রকৃতি বদলে গেছে, তাতে রূহ ও রূহানিয়াত সৃষ্টি হয়েছে। এ অভিজ্ঞতা আমার বহুবার হয়েছে। আপনি অমুসলিম লেখকের সাহিত্য পাঠ করবেন, তাদের রচিত গল্প-উপন্যাস ও কাব্যের রস উপভোগ করবেন, তাদের লিখিত ইতিহাস গলাধ:করণ করবেন অথচ আপনার হৃদয়ে তা রেখাপাত করবে না, আপনার চিন্তা-চেতনাকে তা আচ্ছন্ন করবে না, এটা কী করে হতে পারে? আগুন জ্বালাবে না এবং বিষ তার ক্রিয়া করবে না, এটা কীভাবে বিশ্বাস করা চলে? চেতন মনে আপনি অস্বীকার করুন, কিন্তু আপনার অবচেতন মনে লেখা ও লেখনী তার নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করবেই। আমি মনে করি আপনাদের জন্য এটা বড়ই লজ্জার কথা। বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত না হলে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হতো না যে, যে দেশ যে ভাষায় লক্ষ লক্ষ আলিমের জন্ম হয়েছে সে দেশে সেভাষায় কোরআনের প্রথম অনুবাদকারী হচ্ছেন একজন হিন্দু সাহিত্যিক।

> এদেশের মুসলিম সাহিত্যিকদের আপনারা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরুন। নজরুল ও ফররূখকে তুলে ধরুন। সাহিত্যের অঙ্গনে তাদেরও যে অবিস্মরণীয় কীর্তি ও কৃতিত্ব রয়েছে তা বিশ্বকে অবহিত করুন। নিবিষ্ট চিত্ত ও গবেষক দৃষ্টি নিয়ে তাদের সাহিত্য অধ্যয়ন করুন, অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করুন এবং সম্ভব হলে আরবী ভাষায়ও তাদের সাহিত্য তুলে ধরুন। কত শত আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুসলিম সাহিত্য-প্রতিভার জন্ম এ দেশে হয়েছে তাদের কথা লিখুন। বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে তাদের তুলে আনুন।

আল্লাহর রহমতে এমন কোন যোগ্যতা নেই যা কুদরতের পক্ষ হতে আপনাদের দেয়া হয়নি। হিন্দুস্তানে আমাদের মাদরাসাগুলোতে এমন অনেক বাঙ্গালী ছাত্র আমি দেখেছি যাদের মেধা ও প্রতিভার কথা মনে হলে এখনো ঈর্ষা জাগে। পরীক্ষায় ও প্রতিয়োগিতায় তাদের মোকাবেলায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররা অনেক পিছনে থাকতো। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে মানপত্র দেয়া হয়েছে। আমাদের ধারণাই ছিলো না যে, এত সুন্দর আরবী লেখার লোকও এখানে রয়েছে। কখনো হীনমন্যতার শিকার হবেন না। সব রকম যোগ্যতাই আল্লাহ আপনাদের দান করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এগুলোর সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না।

আমার কথা মনে রাখবেন। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে নিতে হবে। দু'টি শক্তির হাত থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে হবে। অমুসলিম শক্তির হাত থেকে এবং অনৈসলামী শক্তির হাত থেকে। অনৈসলামী শক্তির অর্থ ঐসব নামধারী মুসলিম লেখক-সাহিত্যিক যাদের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনা ইসলামী নয়। ক্ষতি ও দুষ্কৃতির ক্ষেত্রে এরা অমুসলিম লেখকদের চেয়েও ভয়ংকর।

মোটকথা, এ উভয় শক্তির হাত থেকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করুন এবং এমন অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করুন যেন অন্য দিকে কেউ ফিরেও না তাকায়। আলহামদু লিল্লাহ! আমাদের হিন্দুস্তানী আলিম সমাজ প্রথম থেকেই এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। ফলে সাহিত্য, কাব্য, সমালোচনা, ইতহাস- এক কথায় সাহিত্যের সর্বশাখায় এখন আলিমদের রয়েছে দৃপ্ত পদচারণা। তাঁদের উজ্জ্বল প্রতিভার সামনে সাহিত্যের বড় বড় দাবীদাররাও নিষ্প্রভ। একবার একটি জনপ্রিয় উর্দু সাহিত্যসাময়িকীর পক্ষ হতে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিলো। প্রতিযোগীদের দায়িত্ব ছিলো উর্দুভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নির্বাচন। বিচারকদের রায়ে তিনিই পুরস্কার লাভ করেছেন যিনি মাওলানা শিবলী নোমানীকে উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রমাণ করেছিলেন। উর্দুভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক কোন সম্মেলন বা সেমিনার হলে সভাপতিত্বের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতো মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদবী, মাওলানা আব্দুসসালাম নদবী, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শিরওয়ানী, কিংবা মাওলানা আবদুল মাজেদ দরয়াবাদীকে। উর্দু কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসের উপর দু'টি বই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত। একটি হলো মওলভী মুহাম্মদ হোসাইন আযাদ কৃত 'আবে হায়াত', দ্বিতীয়টি আমার মরহুম পিতা মাওলানা আবদুল হাই কৃত 'গুলে রা'না' (কোমল গোলাপ)।

মোট কথা হিন্দুস্তানে উর্দু সাহিত্যকে আমরা অন্যের নিয়ন্ত্রণে যেতে দেই নি। তাই আল্লাহর রহমতে সেখানে কেউ এ কথা বলতে পারে না যে, মাওলানারা উর্দু জানে না, কিংবা টাকশালী উর্দুতে তাদের হাত নেই। এখনো হিন্দুস্তানী আলিমদের মাঝে এমন লেখক, সাহিত্যিক ও অনলবর্ষী বক্তা রয়েছেন যাদের সামনে দাঁড়াতেও অন্যদের সংকোচ বোধ হবে। ঠিক এ কাজটাই আপনাদের করতে হবে বাংলাদেশে।

আমার কথা আপনারা লিখে রাখুন। দীর্ঘ জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন, কিংবা বিমাতাসুলভ আচরণ এ দেশের আলিম সমাজের জন্য জাতীয় আত্মহত্যারই নামান্তর হবে।

প্রিয় বন্ধুগণ! আমার এ দু্টি কথা মনে রেখো; এর বেশী কিছু আমি বলতে চাই না। প্রথম কথা হলো- এই দেশ ও জাতির হিফাযতের দায়িত্ব তোমাদের। সুতরাং ইসলামের সাথে এ দেশের সম্পর্ক কোন অবস্থাতেই যেন শিথিল হতে না পারে। অন্যথায় তোমাদের এই শত শত মকতব-মাদরাসা বেকার ও মূল্যহীন হয়ে পড়বে। আমি সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই। আমার কথায় তোমরা দোষ ধরো না। কেননা আমি তো মাদরাসারই মানুষ, মাদরাসার চৌহদ্দিতেই কেটেছে আমার জীবন। আমি বলছি, আল্লাহ না করুন, ইসলামই যদি এ দেশে বিপন্ন হলো তাহলে মকতব-মাদরাসার কী প্রয়োজন থাকলো, বরং এগুলোর অস্তিত্বের সুয়োগই বা কোথায় থাকলো? সুতরাং তোমাদের প্রথম কাজ হলো এদেশে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করা, ইসলামের সঙ্গে এ জাতির বন্ধন অটুট রাখা। দ্বিতীয় কাজ হলো, যে কোন মূল্যে দেশ ও জাতির নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেয়া। আর তা বাংলাভাষা ও সাহিত্যে পূর্ণ অধিকার এবং সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন ছাড়া কখনো সম্ভব নয়।

আমার খুবই আফসোস হচ্ছে যে, আপনাদের সাথে আমি বাংলাভাষায় কথা বলতে সক্ষম নই। যদি আমি আপনাদের ভাষায় আপনাদেরকে সম্বোধন করতে পারতাম তাহলে আজ আমার আনন্দের কোন সীমা থাকতো না। ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ভাষাই পর নয়, বিদেশী নয়। পৃথিবীর সকল ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি এবং প্রত্যেক ভাষারই রয়েছে নিজস্ব কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য। ভাষাবিদ্বেষ হলো জাহেলিয়াতের উত্তরাধিকার। কোন ভাষা যেমন পূজনীয় নয়, তেমনি ঘৃণা-বিদ্বেষেরও পাত্র নয়। একমাত্র আরবী ভাষাই পেতে পারে পবিত্র ভাষার মর্যাদা। এছাড়া পৃথিবীর আর সব ভাষাই সমমর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ মানুষকে বাকশক্তি দিয়েছেন এবং যুগে যুগে মানুষের মুখের ভাষা উন্নতি ও সমৃদ্ধির বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করে বর্তমান রূপ ও আকৃতিতে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। মুসলমান প্রতিটি ভাষাকেই শ্রদ্ধা ও মর্যাদার চোখে দেখে। কেননা ভাষা আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহর দান এবং মনের ভাব প্রকাশে সব ভাষাই মানুষকে সাহায্য করে। তাই প্রয়োজনে যে কোন ভাষা শিক্ষা করা ইসলামেরই নির্দেশ। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়দ বিন ছাবিত (রা:) কে হিব্রুভাষা শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ হিব্রু হচ্ছে নির্ভেজাল ইহুদী ভাষা। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যদি আমরা উদাসীন থাকি তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তা চলে যাবে বাতিল শক্তির নিয়ন্ত্রণে। ফলে যে ভাষা ও সাহিত্য হতে পারতো ইসলামের শিক্ষা ও দীক্ষা প্রচারের কার্যকর মাধ্যম, সেটাই হয়ে দাঁড়াবে শয়তান ও শয়তানিয়াতের বাহন। আপনাদের এখানে কলকাতা থেকে বিরুদ্ধ সংস্কৃতির সাহিত্য আসছে। সাহিত্যের ছদ্মাবরণে ইসলামবিরোধী বাদ-মতবাদ এবং চরিত্রবিধ্বংসী সংস্কৃতির প্রচার চলছে। তাতে ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংসের মালমশলা মেশানো হচ্ছে, আর সরলমনা তরুণ সমাজ গোগ্রাসে তাই গিলছে। এর পরিণতি কখনো শুভ হতে পারে না।

আপনারা তিরমিযি, মিশকাত, কিংবা মীযানের শরাহ লিখতে চাইলে আরবী-উর্দুতে লিখুন, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু জনগণকে বোঝাতে হলে জনগণের ভাষায় কথা বলতে হবে। যুগে যুগে আল্লহর প্রেরিত নবী-রাসূলকে তাঁদের কাওমের ভাষায় কথা বলতে হয়েছে; নায়েবে রাসূল হিসাবে আপনাদেরও একই তরীকা অনুসরণ করতেহবে।

আমি আপনাদের খিদমতে পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই- পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদীছ, তাফসীর, ফেকাহ ও উছূল শাস্ত্রের উপর এ পর্যন্ত অনেক কাজ হয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যাখ্যা ও টীকাগ্রন্থও লেখা হয়ে গেছে। তাতে নতুন সংযোজনের বিশেষ কিছু নেই। আপনাদের সামনে এখন পড়ে আছে কর্মের নতুন ও বিস্তৃত এক ময়দান। দেশ ও জাতির উপর আপনাদের নিয়ন্ত্রণ যেন শিথিল হতে না পারে। মানুষ যেন মনে না করে যে, দেশে থেকেও আপনারা পরদেশী। স্বদেশের মাটিতে এই প্রবাস-জীবন অবশ্যই আপনাদের ত্যাগ করতে হবে। মনে রাখবেন, এ দেশেই আপনাদের থাকতে হবে এবং এ দেশের সমাজেই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। এদেশের সাথেই আপনাদের ভাগ্য ও ভবিষ্যত জড়িত।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- হে মুসলমানগণ! তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল এবং তোমাদের আবরু-ইজ্জত পরস্পরের জন্য হারাম ও পবিত্র। যেমন এই মাসের এই দিনটি তোমাদের জন্য হারাম ও পবিত্র। যারা উপস্থিত তারা আমার বাণী পৌঁছে দাও ঐলোকদের কাছে যারা অনুপস্থিত।

সুতরাং ভাষাগত পার্থক্যের কারণে কোন মুসলমান ভাইকে অপমান করা, তার ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠন করা, কিংবা তাকে হত্যা করা হবে চরম জুলুম ও অবিচার। আল্লাহ বলেছেন- প্রতিটি বস্তুর জন্য আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ও স্তর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কোন মুসলমানের জন্য সে সীমা লঙ্ঘন করা বৈধ নয়। মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে ভালবাসো। চর্চা-সাধনায় আত্মনিয়োগ করো। তোমার সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটাও, কাব্যের রস উপভোগ করো, কিন্তু অতিরঞ্জন ও সীমা লঙ্ঘন করো না। কোরআন শরীফকেও যদি কেউ পূজা করা শুরু করে এবং উপাস্যজ্ঞানে সিজদা করে তবে সে মুশরিক হয়ে যাবে। কেননা ইবাদত শুধু আল্লাহর প্রাপ্য। তবে সব ভাষাকে স্ব স্ব মর্যাদায় বহাল রেখে মাতৃভাষাকে ভালোবাসা এবং স্বীয় অবদানে তাকে সমৃদ্ধ করে তোলা

শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, অপরিহার্য কর্তব্যও বটে।

বন্ধুগণ! আমি পরদেশী মুসাফির। দুদিনের জন্য এসেছি তোমাদের দেশে তোমাদের মেহমান হয়ে। তোমাদের কল্যাণ কামনায় নিবেদিত হয়ে "কল্যাণকামিতাই দ্বীন" এই হাদীছের উপর আমল করে তোমাদের কয়েকটি উপদেশ দিয়ে গেলাম। যদি পরদেশী মুসফির ভাইয়ের এ দরদভরা আওয়ায তোমাদের মনে থাকে তাহলে একদিন না একদিন অবশ্যই এর গুরুত্ব তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু তা যেন সময় পার হয়ে যাওয়ার পর এবং পানি মাথার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার পর না হয়। একদিন তোমরা অবশ্যই বোঝবে, আমি কী বলেছিলাম এবং কেন বলেছিলাম।

তোমাদের যা বলছি, অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে। আমি আমার যাবতীয় বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সবকিছু দেখেন।

আসমানের ফিরেশতারা যেন সাক্ষী থাকে, কিরামান কাতিবীন যেন লিখে রাখে যে, প্রতিবেশী ভাইদের প্রতি আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণ করেছি। আমি আবার বলছি- শেষবারের মত বলছি, তোমরা যদি এ দেশের মাটিতে বাঁচতে চাও; যদি এখানে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চাও তাহলে এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন। আমীন।

সূত্রঃ দারুল কলম প্রকাশিত "তালিবে 'ইলমের জীবন পথের পাথেয়"

আবুল হাসান আলী নদভী

বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী। উপমহাদেশের গণ্ডী পেরিয়ে যার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল আরব বিশ্বেও। তিনি ১৯১৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর ভারতের উত্তর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। উর্দু এবং হিন্দি উভয় ভাষাতেই তাঁর হাত ছিল সিদ্ধহস্ত। তিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার প্রাক্তন রেক্টর এবং পাশাপাশি রাবেতা মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি রাবেতা ফিকাহ কাউন্সিলের সদস্য এবং মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইসলামের সেবার জন্য ১৯৮০ সালে তিনি মুসলিম বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মাননা বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমান সময়ের স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ তারিক রমাদানের পিতা সাঈদ রমাদান (হাসান আল-বান্নার জামাতা) এর সাথেও সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর উষ্ণ ও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল যা তারিক রমাদানের Islam, The West & The Challenges of Modernity বইটির ভূমিকায় আলোচিত হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক জগত ছাড়িয়ে তিনি মাঠ পর্যায়েও ছিলেন সদা তৎপর একজন পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। মুসলিম সমাজে তো বটেই অমুসলিমদের কাছেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল আকাশচুম্বী। ১৯৯৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বর এই মহান মনীষী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু মুসলিম ভারতের এক ইতিহাসের সমাপ্তি এবং অদূর ভবিষ্যতেও এ শূন্যস্থান পূরণ হবার নয়।